নীলা

গুরুজনদের সাধ-আহ্লাদ, সদিচ্ছার জের পোয়াতে এদেশের ছেলেমেয়েরা যে রকম জেরবার হয় তেমন পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। রূপসী পিসির কথাই ধরা যাক। যশোরের কোন অজ গ্রামে জন্ম হয়েছিল পিসির। পঞ্চ পুত্রের পর ভাতৃজায়া একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছে এ সংবাদ সুদূর রেঙ্গুনে ভাসুরের কাছে পৌঁছনো মাত্র তিনি ফিরতি ডাকে ফরমান পাঠালেন, "নবজাতিকার নাম হোক রূপসী।" নামটি প্রযোজ্য হল কিনা সে সম্বন্ধে কোনরকম তত্ত্বতলাস না নিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সকল সংশয় বিবাদের সম্ভাবনা চিরতরে নির্মূল করে দিয়ে এর অত্যল্পকাল পরেই দেহ রাখলেন ভদ্রলোক। সেই প্রবাসে রেঙ্গুনেই।

রূপসী পিসিকে আমরা তার যৌবনকালে দেখেছি। লোচনহীন পদ্মলোচনও ম্লান হয়ে যায় নামের এই মাত্রা ছাড়া গরমিলের পাশে। বহু চেষ্টাচরিত্তির করেও যখন পিসির জন্যে বর জোটানো গেল না নিরুপায় ঠাকুর্দা শেষে তাঁর তাসের আড্ডার ইয়ারদোস্ত চৌধুরিমশাইকে ধরে পাকড়ে পিঁড়েয় বসিয়ে দিলেন। চৌধুরিমশায়ের তখন বউ ছেলেপুলে নাতিনাতনি নিয়ে জমজমাট সংসার। রূপসী পিসি তার বর্ষিয়সী সতীনের সংসারে গতর খাটিয়েই কাটিয়ে দিলো জীবনটা। কিন্তু আমার এ গল্প রূপসী পিসিকে নিয়ে নয়, আমার কৈশোরের প্রতিবেশী বাসবজিৎকে নিয়ে, যাকে তার গুরুজনেরা আদর করে নাম দিয়েছিলেন 'ধোচন'। পাড়াতেও ক্রমে ওই নামটারই চল হয়ে গেল এবং 'ধোচনদা' অল্প দিনের মধ্যেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। আমিই শুধু ওই কিম্ভূত নামের পাঁচিল ডিঙিয়ে ওর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারিনি কোনদিন।

বাসবজিতের বাবা ডাক্তার সেন রেলওয়ে থেকে রিটায়ার করার পর কানপুরে আমাদের পাড়ায় বাড়ি কিনেছিলেন। ওরা আমাদের পাড়ায়

আসার বছর খানেক পর আমি দিল্লীতে হস্টেলে চলে যাই। ছুটিছাটাতে বাড়ি যেতাম আর সবার মুখে নতুন প্রতিবেশীদের প্রশংসা শুনতাম। বিশেষ করে প্রতিবেশীপুত্র বাসবজিতের। বাসবজিৎ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল। আমার বি.এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে ছোট বোন মিতুলের চিঠিতে জানলাম বাসবজিৎ নাকি হুট করে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করেছে তার এক প্রাক্তন সহপাঠিনীকে। মেয়েটি লখ্‌নউয়ের এক ধনি শিল্পপতির একমাত্র সন্তান। পরীক্ষার পর কানপুরে এসে নীলা বৌদিকে দেখলাম। আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। বাসবজিতের বাবা-মা পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করলেও মেয়ের বাড়িতে তুমুল আপত্তি উঠেছিল গোড়ার দিকে। পরে অবশ্য তাঁরাও মেনে নিলেন বিয়েটা।

নীলা বৌদিকে পাড়ার লোকেরা আড়ালে বলতো দেমাকী। তবে আমার চোখে সেটা দোষের মনে হয় নি। অমন অপূর্ব, রাজেন্দ্রাণীর মত দেখতে যে মেয়ে তার চালচলন তো রানীর মত হবেই। নীলা বৌদি প্রায়ই বাপের বাড়ি যেতো। প্রথম প্রথম দু'একদিন পরেই ফিরে আসতো। ক্রমশ ওখানেই বেশীদিন থাকতে লাগলো। শ্বশুরবাড়ি আসতো কেবল কালেভদ্রে। এর কিছুদিন পরে শুনলাম নীলা বৌদির নাকি বাচ্চা হবে। বাসবজিতের মা সাধের সাজ সরঞ্জাম রেডি করতে লাগলেন। পাড়ার মহিলারা সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ অবধি সাধ বৌদির বাপের বাড়িতেই হল শুধু। এখান থেকে তত্ত্বতলাস পাঠিয়েই সাধ মেটাতে হল এঁদের। বাসবজিৎ তখন স্থানীয় একটা কলেজে লেকচারার। ইদানীং চোখের গোলমালের দরুন কালো পুরু ফ্রেমের চশমা পরে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না কারও সঙ্গে। নিজের ঘরটিতে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে। নাতি হয়েছে খবর পেয়ে ওর বাবা-মা সোনার হার গড়িয়ে তাই দিয়ে নাতির মুখ দেখে এলেন। নীলা বৌদি বাপের বাড়িতেই রয়ে গেল ছেলে সমেত।

ইতিমধ্যে আবার দিল্লী পাড়ি দিয়েছি আমি। তবে এবার আর হস্টেলে নয়, পতিগৃহে। আগের মত ঘন ঘন বাড়ি যেতে পারি না আর। মাঝে মধ্যে অল্প ক'দিনের মেয়াদ নিয়ে ঘুরে আসা। তাই সে বছর দুমাসের লম্বা ছুটিতে বাড়ি যেতে পেয়ে ভারী আনন্দ হল। বাসবজিতের কথা জিজ্ঞেস করায় মা শুকনো গলায় বললো, "ডাক্তার সেন তো বছরখানেক হল মারা গেছেন, মিতুল তোকে লেখেনি?" মা উঠে রান্নাঘরে চলে গেল।

মিতুলকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার রে?"

মিতুল বললো, "জানিস তো দিদি পাথরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাথর নীলা। দুর্লভ রত্ন। কিন্তু সবার কপালে সয় না। গোটা পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল। ডাক্তার সেন মারা গেছেন। ধোচনদা উন্মাদ হয়ে গেছে। মাসিমার দিকে তাকালে বুক ফেটে যায়।"

"আর নীলা বৌদি?"

"এখন আর বৌদি নেই। কবে ডিভোর্স হয়ে গেছে। শুনলাম আবার বিয়ে করেছে দিল্লীর এক অশোক নন্দীকে।"

"বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার দুঃখে পাগল হয়ে গেল?"

"কে জানে ! কেউ কেউ বলে পাগল বলেই বিয়ে টিঁকলো না। কিন্তু আগে তো কখনো ওকে দেখে সন্দেহ হয়নি। বেশ সুস্থ স্বাভাবিকই তো ছিল এতকাল।"

মিতুলের কাছে শোনা বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে এই :- নীলা ইদানীং লখ্‌নউ'এ তার বাপের বাড়িতেই থাকতো। বাসবজিৎ আর যেতো না। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কথা চাপা রইলো না বেশীদিন। দুই তরফেই বাবা-মা'রা চাইতেন যে মিটমাট হয়ে যাক কিন্তু মিয়া-বিবি রাজি না হলে তৃতীয় ব্যক্তির করণীয় কিছু নেই ----। নীলার বাবা ঘটা করে নাতির মুখেভাত দেবেন, কর্তা গিন্নী বেয়াই বাড়ি গিয়ে মহা সমাদরে নেমন্তন্ন জানিয়ে এলেন। জামাইয়ের দু'হাত ধরে মিনতি করলেন সে যেন অতি অবশ্য আসে। নির্ধারিত দিনে বাবা-মা'র পীড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে বাসবজিতও তাঁদের সঙ্গে গেল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সারা বাড়ি আলোয় ঝলমল করছে, বিলিতী ব্যাণ্ডের বাজনা ছাপিয়ে অতিথি অভ্যাগতের কলোচ্ছ্বাস। বাসবজিৎ এককোনে মুখ কালো করে বসে আছে চুপচাপ।

বয়স্কা আত্মীয়াদের মধ্যে উৎসাহী একজন বাচ্চাটাকে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "কি গো, এখনও নতুন জামাই সেজে বসে থাকবে নাকি? নাও, ছেলেকে কোলে নাও।" বাসবজিৎ ছিট্‌কে সরে আসে। আত্মীয়াটিও এত সহজে পিছপা হবার পাত্রী নন। বাচ্চাটাকে ওর গায়ের ওপর ছেড়ে দেন। বাসবজিৎ ঝটকা মেরে শিশুকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "আমি ওর বাবা নই। যে বাবা তার কোলে দিয়ে আসুন

গিয়ে ----।" তারপর সেই উৎসবসভা ছেড়ে ঝড়ের বেগে বাইরে এসে সোজা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পরে। খানিক বাদে বেয়াই বাড়ি থেকে সুপ্রচুর অবমাননা কুড়িয়ে বজ্রাহত ডাঃ সেন সস্ত্রীক বাড়ি ফিরে এসে দেখেন ছেলে তাঁদের নিথর জড়পুত্তলিতে পরিণত হয়েছে। এরপর আর কোনদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি বাসবজিৎ। নীলা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে কোর্টে কেস ঠুকলো। প্রথম দিকে তার মা-বাবা আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁদের বনেদি পরিবারে ওরকম একটা কেলেঙ্কারি তাঁরা চাননি। কিন্তু শেষ অবধি ওঁরাও মেয়ের দিকটাই দেখেছেন। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন আবার।

স্তব্ধ হয়ে মিতুলের কাহিনী শুনে গেলাম। কোনও মন্তব্য জোগালো না মুখে।

পরদিন মিতুলের সঙ্গে বাজার করে ফিরছি। রাস্তার মোড়ে আধময়লা পাজামা ও গেঞ্জি গায়ে একটা লোককে দেখে মিতুল আমায় খোঁচা মেরে চাপা গলায় বললো, "ওই দ্যাখ ধোচনদা যাচ্ছে।" লোকটা কাঁধ দুটো দুমড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছিল। একটু দূরে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জটলা করে কি যেন বলছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। আর একটু কাছে যেতেই শুনতে পেলাম ওরা ছড়া কেটে কেটে বলছে,

"ধোচন ধোচন ক্যায়সা নাচন

ধপা ---ধপ্ কাপড় কাচন ----।"

বারে বারে এই দু'টো লাইনই বলছে বাচ্চাগুলো। লোকটা পিছন ফিরে লাল লাল চোখ করে তাকালো। অসহ্য রাগে দাঁত কিড় মিড় করতে লাগলো। বাচ্চাগুলো হাসতে হাসতে ছুটে পালালো। দূরে গিয়ে আবার সুর করে বলতে লাগলো,

"ধোচন ধোচন ক্যায়সা নাচন

ধপা ---ধপ্ কাপড় কাচন ----।"

মিতুল আমার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললো, চল দিদি বাড়ি যাই। বাড়িতে ঢোকার পরও বাচ্চাগুলোর ক্রুর কলোচ্ছ্বাস কানে আসছিল। হঠাৎ মনে হল বাসবজিতের আত্মীয়স্বজনরা বোধহয় ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁদের দেওয়া ডাকনামখানা আজ আর একটুও বেমানান শোনাচ্ছে

না।

এরপর আর কানপুর যাওয়া হয়নি আমার। বাবা-মা দুজনেই অতি অল্পদিনের মধ্যে দেহ রাখলেন। মিতুলের আগেই বিয়ে হয়ে গেছিল। কানপুরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। তবে কার কাছ থেকে মনে নেই ধোচনদার মারা যাবার খবরটা পেয়েছিলাম আমি। বাসবজিতের কাহিনী এখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস কে বলতে পারে?

দিল্লীতে একটা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম। দেশে আত্মহত্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে 'বন্ধু' নাম দিয়ে। সংসার-অভিজ্ঞ সমবেদনশীল স্বেচ্ছাসেবীরাই এর প্রাণকেন্দ্র এবং সমবেদনা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে হতাশ মরিয়া মানুষগুলোকে আশ্বাস ও অবলম্বন জোগানোই তাদের কাজ। 'বন্ধু'র সদস্যতালিকায় কিছু চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ ও আইনজীবির নামও আছে। তবে তাদের ভূমিকা অনেক পরে। প্রাথমিক অবস্থার জন্য আছেন সাধারণ কর্মীরা।

'বন্ধু'র অফিস শুধু দিনের বেলাতেই খোলা থাকে না, রাত্রেও কোন না কোন কর্মী ডিউটিতে থাকেন। বলা যায় না কখন কোথা থেকে ডাক আসে। সেদিন রাত্রে আমার ডিউটি ছিল। শাখার পরিচালিকা ডক্টর অনিমা দত্তের বাসা বাড়ির একটি ঘরে নৈশ অফিস। চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। খানিক আগে বাড়ির ভিতর থেকে খাবার দিয়ে গেছে। টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে রাখা আছে সে খাবার। ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, "বন্ধু বলছি ----।"

লাইনের অপর প্রান্ত থেকে দ্বিধা জড়ানো মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো, "কিছু মনে করবেন না ---- হঠাৎ এভাবে ফোন করছি ----।"

"মনে করবো কেন? আমি বন্ধু। সেই জন্যই তো রয়েছি এখানে!"

মহিলা ইতস্তত করে বললো, "শুনুন, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। শুধু কথা। আপনি শুনবেন?"

"নিশ্চয়ই শুনবো। ফোনেই বলতে চান? ইচ্ছে করলে এখানে চলে আসতে পারেন। টেবিলে রাতের খাবার রাখা আছে। ফ্লাস্কে কফি আছে। আসুন না, দু'জনে মিলে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।"

মহিলাটি হাসলো, "আমার কথা শোনার পর আর আমার সঙ্গে বসে খাবার প্রবৃত্তি হবে না আপনার।"

"এমন বলবেন না। মানুষের জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, আবার কেটেও যায় তা। আপনি হয়তো জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই বেশী পেয়েছেন। সেটা আপনার দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের জন্য কি কেউ অন্যের চোখে ছোট হয়ে যায়?"

"কিন্তু কেউ যদি সাধ করে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনে? ইচ্ছে করে অন্যকে অসুখী করে, তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়?"

বললাম, "অপরিণত বুদ্ধি মানুষকে এমন অনেক কাজে এগিয়ে দেয় যার পরিণাম শুভ নয়। কিন্তু অপরিণত বুদ্ধিও তো বলতে গেলে দুর্ভাগ্যই। পরে মানুষ যখন ঠেকে শেখে এবং পশ্চাতাপ করে তখন মানুষের শুভ বুদ্ধি জেগে ওঠে। পশ্চাতাপের আগুনে পুড়ে শুচি-শুদ্ধ হয়ে আবার সে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ায়।"

আমাদের কর্মীদের শেখানো আছে কথাবার্তার মাধ্যমে অপর পক্ষের আত্মগ্লানি অপসারণের চেষ্টা করতে। সাধারণত হবু আত্মঘাতীরাই এভাবে ফোন করে। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে, ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ভেসে থাকতে চায়। মহিলাটির কথায় কেমন একটা মরিয়া বেপরোয়া ভাব।

বললাম, "আপনি কোথা থেকে বলছেন? আপনি যদি চান আমি আপনার কাছে যেতে পারি। আমাকে সঙ্কোচ করবেন না। বিশ্বাস করুন, অপরিচিত হলেও আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।"

"আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি। সেইজন্যই এই অসময়ে ফোন করে এতগুলো কথা বলছি। আমার ফেরার কোনও পথ নেই। সব কিছু শেষ হয়ে গেছে আমার এবং তার জন্য দায়ী আমি নিজে। আমার পাওনা শাস্তি থেকে আমি অব্যাহতি চাই না। শুধু যাবার আগে সব কিছু বলে যেতে ইচ্ছে করছে। অথচ এমন কেউ নেই যাকে এসব কথা বলা যায়। চিঠিতে লিখে যেতে চাই না। আমার কেলেঙ্কারি নিয়ে লোকে হাসাহাসি করবে ভাবতে খারাপ লাগে। আমার বাবা-মা এখনও জীবিত।

সমাজে তাঁদের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হোক তা আমি চাই না।"

"কিন্তু আপনার বাবা-মার কথা সত্যিই কি ভাবছেন আপনি? এত বড় আঘাত ওঁরা সইতে পারবেন কি?"

"প্লীজ, আমাকে বাধা দেবেন না। আমার আর এ ছাড়া কোনও পথ নেই। আমার কথাগুলো যদি শোনেন মনে অনেক শান্তি পাবো। আপনি আমার পরিচয় জানেন না, তাই আপনাকে খুলে বলা যায় সব কিছু। শুনুন তবে। বড়লোক বাপ-মার একমাত্র আদুরে সন্তান হ'বার দরুন কিনা জানি না, ছোটবেলা থেকেই ভীষণ জেদী আর অবাধ্য ছিলাম। এম.এ. পরীক্ষা হয়ে গেলেই তাঁর পছন্দ করা বিলেত ফেরৎ পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন মনস্থ করে বাবা বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করছেন ইতিমধ্যে আমি দুম্ করে আমার এক সহপাঠীকে বিয়ে করে বসলাম। প্রতিবারের মত এবারও আমার জেদই জয়ী হল। বাবা-মা বিয়েটা মেনে নিলেন।

"ব্যারিস্টার পাত্রের মত বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠাবান না হলেও শিক্ষিত, সুদর্শন, সচ্চরিত্র স্বামী পেয়েছিলাম আমি। ছিমছাম ভদ্র সচ্ছল শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। আমার স্বামী আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির শান্ত পরিবেশ এবং নির্ঝঞ্ঝাট ঘরকন্নায় আমার মন ভরলো না। বাপের বাড়ি ফিরে এলাম।

"বিয়ের আগের বন্ধুবান্ধবরা আবার একে একে এসে জুটলো। আমি মৌচাকের মৌরানী হয়ে উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। আমার স্বামী বুঝতে পেরেছিল কিন্তু ঘেন্নায় সে কথা প্রকাশ করেনি। এরপর আমার একটি সন্তান হল ---- আমার অবিমৃষ্যকারিতার মাসুল। স্বামীর সহ্যশক্তি তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে আসছিল। শেষে একদিন সুস্থ সবল মানুষটা রাগে দুঃখে অপমানে পাগল হয়ে গেল। ভাল অধ্যাপক হিসেবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ সুনাম হয়েছিল। অনেক স্বপ্ন ও উচ্চাশা ছিল এবং অনেক সম্ভাবনাও। সবকিছু নির্মূল হয়ে গেল। ওদের গোটা সংসারটাই নষ্ট হয়ে গেল বলতে গেলে। আর আমি ভণ্ডামির মুখোশ পরে অবমানিত অপাপবিদ্ধ পত্নীর ভূমিকায় সকলের সমবেদনা কুড়োতে লাগলাম।

"বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার বিয়ে করলাম। আমার দ্বিতীয় স্বামী সব দিক দিয়েই প্রথম স্বামীর একেবারে বিপরীত। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের আদরের বউ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি, এইবার মদ্যপ লম্পটের লাঞ্ছনা তাড়না রোজকার প্রাপ্য হল। সবরকম অপমান নির্যাতন মুখ বুঁজে সইতে চেষ্টা করেছি। আমার প্রথম বিয়ে না টেঁকার জন্য একজন নিরপরাধ মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলাম। কিন্তু এ বিয়েটাও যদি না টেঁকে তবে যে লোকে আমাকেই দায়ী করবে ! আমার বিবাহবিচ্ছেদের কথা জেনেও আমাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে, এমন কি আমার সন্তানের ভার নিতেও এতটুকু দ্বিরুক্তি প্রকাশ করেনি ---- তার এই মহানুভবতায় আমার বাবা-মা, আত্মীয় পরিজন, তাবৎ পাড়াপ্রতিবেশী অভিভূত। আসলে লোকটা যে কি রকম খল কপট লোভী শয়তান তারা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আমার বাবা-মাকে এমন ভাবে বশ করেছে যে তারা এখন ওর কথায় ওঠে বসে, ও যা বলে তাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয। আর ওদিকে আমার স্বামী দু'হাতে তাদের টাকা ওড়াচ্ছে বিলাস ব্যসন ব্যভিচারে গা ডুবিয়ে। আমার উপর অকথ্য অত্যাচার বেড়েই চলেছে প্রতিদিন ----," অপরিসীম ক্ষোভে কণ্ঠস্বর বুঁজে এলো তার।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ভেঙে পড়না বোন। আমার কাছে চলে এসো। আমাদের সংস্থা যে করে হোক একটা উপায় বার করবে। দরকার হলে উকিলের সাহায্য নিয়ে তোমাকে তোমার স্বামীর কবল থেকে বার করে আনবো আমরা।"

মেয়েটি কান্নাভেজা গলায় হাসলো, "আর কোন উপায়ই যে বাকি নেই। বললাম তো, সব কিছু শেষ করে দিয়েছি নিজের হাতে। পরশপাথর কবিতার সেই লাইনগুলো মনে আছে আপনার?

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি

স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর,

বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান

ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর ----

কিন্তু আমার পরশমনি, যে আমাকে আদরে সোহাগে রাজেন্দ্রাণীর আসনে বসিয়েছিল, তাকে যে আমিই শেষ করে দিলাম। অপমান ও কলঙ্কের কালি মাখালাম। ভালবেসে সে আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল আর আমি কালনাগিনী তার বুকে ছোবল বসালাম। সইতে না পেরে মানুষটা শেষে

পাগল হয়ে গেল। উঃ ভগবান ! পাগল হয়ে গেল ----।"

সমাজসেবীকে সর্ব অবস্থায় ধীর স্থির শান্ত থাকতে হয় কিন্তু আমার বুকের মাঝে তোলপাড় করতে লাগলো। তবু কোনরকমে বললাম, "তাঁর চিকিৎসা হতে পারে। হয়তো ভাল হয়ে যাবেন তিনি ----।"

"সে আর এ জগতে নেই। মরে গিয়ে মুক্তি পেয়েছে সে। জানিনা পরজন্ম বলে কিছু আছে কিনা। যদি থাকে, আর পরজন্মে যদি তার দেখা পাই আমায় দেখে হয়তো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে সে। কিন্তু তবু আমাকে যেতেই হবে তার কাছে। তার ক্ষমা না পেলে আমার মুক্তি নেই ----।"

কট্ করে লাইন কেটে গেল।

আকুল হয়ে ডাকলাম, "শুনুন, শুনুন, প্লীজ ----।"

রিসিভার থেকে কর্ কর্ কর্ ডায়াল টোনের আওয়াজ ভেসে এলো শুধু ----।

পরদিন কাগজের পাতায় ছোট্ট একটা খবর চোখে পড়লো ---- শ্রীমতী নীলা নন্দী নামে এক মহিলা নিজামুদ্দিনের কাছে লোকাল ট্রেনে কাটা পড়েছে।